ড. এ. কে. এনামুল হক

টিকাকরণে পুরস্কার-তিরস্কার ও আইনের শাসনের অর্থনীতি

ক্রমে স্থবির হয়ে পড়ছে সবকিছু। আমার নিজের অভিজ্ঞতাও ভালো নয়। যতই করোনার প্রকোপ বাড়ছে ততই আমাদের ভয় বাড়ছে। কখন যে বিপদে পড়তে হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সবাই ভাবছে এ রোগ আমাদের নয়। বড়লোকের। অতএব, আমাকে কেন ভাবতে হবে? টিকা নিয়ে আমরা এখন অনেকটা এগিয়েছি। তবে অবস্থাদৃষ্টিতে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে টিকা সব ঠিক করে দেবে। কথা হচ্ছিল আমার এক বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে। থাকে সিয়াটেলে। তার ভাষ্যে টিকার পরও সংক্রমণ বাড়ছে। সেখানে আবার ডাক এসেছে মাস্ক কার্যকর করার। স্বাধীনতাকামী মার্কিনরা টিকা দেয়ার পর ভেবেছিল আর মুখ ঢাকার দরকার নেই। এসব 'মুসলিম নিয়ম' আমাদের জন্য বেমানান। কিন্তু তা হয়নি, দেখা যাচ্ছে যে টিকা দেয়ায় মৃত্যু ঠেকানো গেলেও সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। তাই আবার মুখ ঢাকার নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনদের বিপদ অন্যত্র। তাদের অর্ধেক জনগণ মনে করে না যে রোগটির অস্তিত্ব রয়েছে। তারা ভাবছে সরকার তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। তারা টিকা নিতে উৎসাহী নয়। অনেক শহরেই তাই টিকা নেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো একটি স্টেট বলেছে যে টিকা নিলে তারা বন্দুক উপহার দেবে। উদ্দেশ্য, যদি তাতে জনগণ অন্তত টিকা দেয়।

এমন অবস্থা অনেক দেশেই। অর্থনীতির একটি নিয়ম হলো পুরস্কার ও শাস্তি। অর্থাৎ মানুষকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে হলে চাই পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা। সঠিক পুরস্কার ও শাস্তির বিধান থাকলে মানবজাতি অনেক সময়ই তার আচরণ বদলায়। হয়তোবা এজন্যই প্রতিটি ধর্মেও রয়েছে পুরস্কার ও শাস্তির বিধান। নির্বাণ লাভ, পুনর্জন্ম কিংবা বেহেশত প্রাপ্তি যেমন মানুষকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তেমনি শাস্তির ভয়ও মানুষকে শান্তির পথে চলতে বাধ্য করে।

পৃথিবীর সব দেশেই টিকা নিয়ে সরকার নানা বিপর্যয়ে পড়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সরকার টিকা নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবস্থা নিয়েছে লটারির। তারা টিকা নেয়ার পর লটারিতে কাউকে দিয়েছে গরু, কাউকে দিয়েছে মুরগি, কাউকে দিয়েছে সাইকেল। এমন সব অদ্ভুত ব্যবস্থা করতে হয়েছে, কারণ জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ বিশ্বাসই করতে চায় না যে কভিড বলে কিছু আছে।

চীন সরকারকে আমরা বলে থাকি, তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাদের জনগণ সরকারের কথার বরখেলাপ করার সাহস রাখে না। অন্তত পশ্চিমাঘেঁষা সংবাদমাধ্যম বা সংস্থাগুলো তাই প্রচার করতে ভালোবাসে। কিন্তু তারাও ব্যর্থ হচ্ছে। তাই শেষ পর্যন্ত তারাও আশ্রয় নিয়েছে টিকা গ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করার। তাদের ১৪০ কোটি জনগণের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ২২ কোটি টিকা নিয়েছে। বুঝতেই পারছেন তারা এখনো বেশি লোককে টিকা দিতে পারেনি। অতএব, কী করা যায়? তারাও বলছে জনগণকে টিকা নিতে আর বলছে যদি টিকা নেয়, তবেই তারা পাবে ডিম, খাবার কিংবা টিস্যু পেপার কেনার কুপন। খোদ বেইজিংয়ে টিকা গ্রহণকারীদের ঘটা করে সুনাগরিকের সনদ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি তাইওয়ান তাদের জনগণকে টিকা নিতে উৎসাহিত করতে শেষ পর্যন্ত চিকেন ফ্রাইসহ নানা খাবার উপহার দিয়েছে।

এতগুলো উদাহরণ দিলাম কারণ আমাদের সরকার এরই মধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে দেশের অন্তত ৮০ শতাংশ জনগণকে টিকা দিতে। কিন্তু দেয়াটা সহজ হবে না। ছোটবেলা স্কুলে টিকার কথা শুনলেই দেখতাম ছাত্ররা স্কুলের দেয়াল টপকাচ্ছে। অথবা আগের দিন টিকাওয়ালা আসবে শুনলে পরদিন ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যেত। ব্যাপারটি ভুলে গেলে চলবে না। একই সঙ্গে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট করি। গত মার্চ পর্যন্ত চীনে মাত্র সাড়ে ৭ কোটি লোক টিকা নিয়েছিল। তা তাদের মোট জনগণের মাত্র ৫ শতাংশ। তা দিয়েই তারা দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড় করাতে পেরেছিল। তখনো তাইওয়ানে একজনও টিকা নেয়নি। তাদের অর্থনীতি তাতে থামেনি। এ মুহূর্তে চীনে টিকার তোড়জোড়ের একটি বাড়তি কারণ হলো, আগামী শীতে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে চীনে। নানা দেশের লোক তাদের দেশে আসবে, তখন তারা কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। তাই তারা তাড়া তাড়ি করছে, যাতে বড় বড় শহরের অধিকাংশ জনগণকে টিকার আওতায় আনতে পারে। বলতে পারেন, তাহলে তারা কী মন্ত্র পড়ে দেশের অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে দিল? মন্ত্রটি ছোট। সবাই মাস্ক পরেন। এখন পর্যন্ত কভিডের এটাই মূলমন্ত্র। বাকি মন্ত্র জপ কেবল ব্যবসার জন্য। বহুবার বলেছি। মাস্ক ছাড়া আর কোনো মন্ত্র এখনো কার্যকর হয়নি। তবে টিকা দরকার মৃত্যু ঠেকাতে।

গত কয়েক সপ্তাহে যে হারে আমাদের জনগণ কভিড আক্রান্ত হয়েছে, তাতে অনেকেই ভীতসন্ত্রস্ত। ব্যাপক জনগণ কিন্তু তাতে ভয় পায়নি। ভাববেন না যে শিক্ষা কিংবা জ্ঞানের অভাবে মানুষ ভয় পাচ্ছে না। বিষয়টি আদৌ তা নয়। সবাই মনে করে আমি তো পাপ করিনি। ধারণা হচ্ছে, কেবল পাপীতাপীরাই কভিড আক্রান্ত। গতকাল দেখলাম এক টিভির সাংবাদিক কোনো এক ক্রিকেট তারকার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছেন মিরপুর স্টেডিয়ামে। ক্রিকেটারের সঙ্গে দেখা হতেই তার সঙ্গে 'হাত মেলালেন'। খেলোয়াড় কিংবা সাংবাদিক দুজনেই শিক্ষিত ও কভিড সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। কিন্তু তাদের দুজনের মাথায় আসেনি যে হাত নয়, কনুই মেলানোর রীতি কভিডকালীন। আর তারা তা দেখালেন টিভি চ্যানেলে। জনগণকে কী শেখালেন? হতভম্ব আমি টিভি চ্যানেলটিই বন্ধ করে দিলাম।

কোরবানি আসছে। গরুর মিলনমেলা বসবে। যতই বলুন না কেন, আমরা এবার অনলাইনে কোরবানি দেব কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, তা হবে না। কারণ সিংহভাগ জনগণ তা মানবে না। তাই মুখোশ পরিধানের জন্য আমাদের উচিত যুদ্ধ ঘোষণা করা। যাকেই পাবেন মুখোশবিহীন, তাকেই শাস্তির আওতায় আনুন। হাসপাতালে রোগী কিন্তু পাশেই রয়েছেন স্ত্রী কিংবা সন্তান। তার মুখেই নেই মাস্ক! কেউ ভাবতে পারছেন না যে পরের ডাক আমারই হবে।

সংক্রমক রোগের ধর্ম ভুলে গেলে চলবে না। সংস্পর্শে এলেই সংক্রমণ। মৃত্যু অনিবার্য না হলেও ভোগার বিকল্প থাকবে না। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনের দায়িত্ব নিয়ে আমার চোখ আরো কিছুটা খুলেছে। তার একটি বর্ণনা দিই। সবাই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় চলছে অনলাইনে। আমাদের শিক্ষকদের অনেকেই অনলাইনে পাঠদান পছন্দ করেন না। এখানে অনেকটা বাক্সের সঙ্গে কথা বলতে হয়। যারা অভ্যস্ত কিংবা যারা প্রযুক্তিতে অগ্রজ তারা অতটা বিরক্ত নন। তবে এটা সত্য, যখন প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত আমরা শিক্ষকরা ছাত্রদের দেখতে পাইনি তখন নিজেকে অনেকটা নাটকের অভিনেতা মনে হয়। তাই যারা নিজেদের অভিনেতা ভাবতে চান না, তাদের সবাই চান ক্যাম্পাস খুলে দেয়া হোক। এ দাবি অন্যায় নয়, তবে মূর্খতা। সেদিন শিক্ষামন্ত্রী সংসদে এ বিষয়ে একটি চমৎকার বক্তব্য দিয়েছেন। তার বাগ্মিতার প্রশংসা করি। কিন্তু আমাদের অনেকেই তা মানতে চান না। ভাবেন আমি তো ভালোই আছি, ছাত্ররা অনলাইনে রয়েছে, তাই ক্লাসরুমে এলেই হয়! যা বলছিলাম, নিয়ম অনুযায়ী ডিন হিসেবে আমাকে ছাত্রদের অনেক দরখাস্ত দেখতে হয়। একসঙ্গে ১০০ বা তার বেশি দরখাস্ত দেখে (বলা বাহুল্য দরখাস্তগুলো অনলাইনেই এসেছে) আমি পড়তে লাগলাম। কারো বাবা অসুস্থ। কভিড আক্রান্ত। কারো মা হাসপাতালে। কারো বাবার ব্যবসা স্থবির। কেউ নিজে অসুস্থ। কেউ অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছে কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারছে না। সবই কভিডের ভুক্তভোগী। অনলাইনে থেকেই এমন শখানেক দরখাস্ত পড়ে আমার মন কেঁদেছে। যতই বলি আমরা ভালো আছি। অন্যকে আমরা দেখছি না। ভাবছি না এতগুলো লোক অসুস্থ অথচ আমরা কেন সচেতন হতে পারছি না? তাদের অসচেতনতার জন্য দেশের অর্থনীতি ক্রমে অন্ধকার গহ্বরে চলে গেলে কী হবে? তাই টিকার কার্যক্রম চলুক, তবে যারা মাস্ক পরিধানে অসচেতন কিংবা নিয়ম পালনে ব্যর্থ তাদের অপরিণামদর্শী আচরণের দায় যেন দেশকে দিতে না হয়, তার জন্য প্রয়োজন কঠোর নিয়ম।

শেষ করি একটি সংবাদ দিয়ে। চট্টগ্রামের সেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাণ্ড নিয়ে। একজন ডাক্তারকে তিনি তার কথামতো মোটরসাইকেলে পেয়েছেন। তার ভাষায়, তিনি হেলমেট পরিহিত ছিলেন না। তাই তাকে জরিমানা করা হয়েছে। তিনি মাস্ক পরিহিত ছিলেন কিনা তা বলা হয়নি। তবে তিনি শত প্রয়োজনে বের হলেও হেলমেট না পরার কারণে অপরাধ করেননি, তা বলা যাবে না। তাকে ডাক্তার বলে ছাড় দেয়ার কোনো রীতি থাকা উচিত নয়। সেই অপরাধে যদি ম্যাজিস্ট্রেটকে বদলি হতে হয়, তবে দেশে নিয়মকানুন অকেজো হবে। আমাদের প্রধান শত্রু হলো, আমরা নিজেদের আইনের উর্ধ্বে ভাবি। কোনো পেশাদার শক্তি হলে তার দোহাই দিয়ে যদি আইন অমান্য করে পার পেয়ে যাই, তবে কোনো অপরাধীকেই শাস্তি দেয়া যাবে না। তথাকথিত কঠোর লকডাউন শেষ পর্যন্ত শ্বাস-ডাউনেই রূপান্তরিত হবে শত শত মানুষের জন্য। আশা করি সবাই ভাববেন।

কারো বাবা অসুস্থ। কভিড আক্রান্ত। কারো মা হাসপাতালে। কারো বাবার ব্যবসা স্থবির। কেউ নিজে অসুস্থ। কেউ অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছে কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারছে না। সবই কভিডের ভুক্তভোগী। অনলাইনে থেকেই এমন শখানেক দরখাস্ত পড়ে আমার মন কেঁদেছে। যতই বলি আমরা ভালো আছি। অন্যকে আমরা দেখছি না। ভাবছি না এতগুলো লোক অসুস্থ অথচ আমরা কেন সচেতন হতে পারছি না? তাদের অসচেতনতার জন্য দেশের অর্থনীতি ক্রমে অন্ধকার গহ্বরে চলে গেলে কী হবে? তাই টিকার কার্যক্রম চলুক, তবে যারা মাস্ক পরিধানে অসচেতন কিংবা নিয়ম পালনে ব্যর্থ তাদের অপরিণামদর্শী আচরণের দায় যেন দেশকে দিতে না হয়, তার জন্য প্রয়োজন কঠোর নিয়ম

ড. এ. কে. এনামুল হক : অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট